কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে নৈবেদ্য - দাও গো সুরের দীক্ষা

সিরাজুস সালেকিন

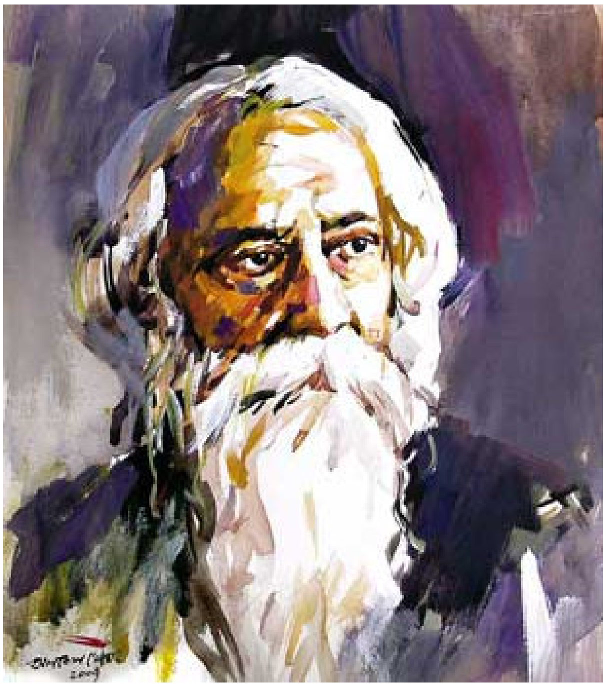

এই তো সেদিন প্রতীর্তির আয়োজনে অনুষ্ঠিত হোলো বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের ৮০ ভাগ গানই ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের। পৃথিবীর যে কোন জায়গায় বাঙালি বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে, রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া তাদের গতি নেই। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত - যে কোন ঋতুকে স্বাগত জানাতে, কারও জন্মদিনে, মৃত্যুবার্ষিকী, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় - যে কোন অনুষ্ঠানই হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতা চাই। এক কথায় বলতে গেলে বাঙালির সব আনন্দে, উৎসবে, প্রেমে, বিরহে, শোকে, শান্তনায় - রবীন্দ্রনাথ যেন আমাদের জীবনসঙ্গী হয়ে গেছে। তাঁর সামগ্রিক সৃজনশীলতা আমাদেরকে আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে। তাকে ছাড়া বাঙালির জীবন পূর্ণতা লাভ করে না - তা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। শিল্প-সংস্কৃতিতে বাঙালির গৌরব করার মত অনেকেই আছেন - তবে তার প্রধান পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ।

ভাবতে বসে অবাক হই যে প্রায় দেড়শো বছর আগে জন্মেও একজন মানুষের সৃস্টি কেমন করে আমাদেরকে জড়িয়ে ফেলেছে। এর থেকে বেরোবার কোনো উপায় যেন নেই বাঙালির। আর বেরোবোই বা কেন। বাঙালির অন্তরে প্রোথিত যে ধন, তা লালন করে যদি আনন্দ পাই, শোকে-বিরহে শান্তনা পাই, দু:খ-কষ্টে বেদনা লাঘব হয়, থাকুক না তা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গী হয়ে। রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা তো এখানেই।

১৯৭১ এ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার সোনার বাংলা গানটি আমাদেরকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করেছিল। বাঙালির বড় আপন হয়ে গেছিল এ গানটি। দেশমাতার মলিন বদন ধুইয়ে দিতে প্রাণ দিয়েছিল লক্ষ বাঙালি। কি শোভা কি ছায়া গো - কি স্নেহ কি মায়া গো - এ যেন আমাদের সবার প্রাণের কথা।

বাঙালির হৃদয়ে অনুভুতির বসবাস স্পর্শকাতরতায় ভরা। সামান্য কারণে বাঙালির মন আনন্দে নেচে ওঠে, দু:খে বিষাদময় হয়ে ওঠে। আমরা অনেকেই গান শুনে হাততালি দেই, কিন্তু অনেকেই গানের কথা বা এর সুরকে যথাযথ মূল্য দেয়ার কথা ভাবি না। আমার মনে পড়ে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বাবু ভাই (জাহেদুর রহিম) যখন মারা গেলেন তখন ছায়ানটের শোকসভায় সনজিদা আপা গেয়েছিলেন:

এখনো গেল না আঁধার এখনো রহিল বাধা
এখনো মরণব্রত জীবনে হোলো না সাধা।

কবে যে দুখ জ্বালা হবে রে বিজয়মালা
ঝলিবে অরুণরাগে নিশীথরাতের কাঁদা।।

এখনো নিজেরই ছায়া রচিছে কত যে মায়া
এখনো কেন যে মিছে চাহিছে কেবলই পিছে
চকিতে বিজলি আলো চোখেতে লাগালো ধাঁদা।।

তখন বয়স কম ছিল - খুব একটা বুঝতে পারিনি এ গানের মর্ম। তবে এ গানটা গাওয়ার সময় আমরা সবাই যে ডুকরে কাদছিলাম, তা আমার মনে আছে। প্রায় ৫০০/৬০০ ছাত্র-ছাত্রীর একসাথে কাঁদা - সে বোধহয় শুধু গানটির কথা ও সুরের কারণেই। সুর ও যে মানুষকে কাঁদায় - সেটা প্রথম বুঝলাম সেদিন। তারপর থেকে কত সুর যে আমাকে কতবার কাঁদিয়েছে - তার হিসেব নেই।

সময়টা খুব সম্ভব ১৯৭৭/৭৮ সাল। আমি তখন ঢাকায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমন্ত্রণে কবিগুরুর ১২৫তম জন্মদিনে গান গাইতে গেলাম কলকাতায়। ৮ জনের একটি দল, আবদুল আহাদ, কলিম শরাফী, ইফফাত আপা, পাপিয়া আপা, বন্যা, আমি, তপন দা, সাদি। প্রথমদিন ছিল বাংলাদেশী শিল্পীদের গান - অনুষ্ঠান হচ্ছে রবীন্দ্রসদনে, হল ভর্ত্তি লোক, হলের বাইরেও অনেক লোক। আমার গান শেষ হওয়ার পর আমি হলের ভেতর একটি চেয়ারে এসে বসলাম। আমাদের সবার গান শেষ হোলে আহাদ চাচা গাইতে বসলেন। তখন ওনার বয়স প্রায় ৭০ এর কাছাকাছি। বলে রাখি যে, আহাদ চাচা শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশী মুসলমান যিনি রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় শান্তিনিকেতনে গান শিখেছেন। অল-ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে ঠুংরি-গজল প্রতিযোগীতায় প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক পান। অত্যন্ত গুনী শিল্পী ছিলেন এই আবদুল আহাদ। যাই হোক, শেষ গান ধরলেন তিনি - এখনো গেল না আঁধার - এখনো রহিল বাধা....। সেই একই গান। এত দরদ দিয়ে গাইছিলেন - একেবারে গানের ভেতরে ঢুকে গেছিলাম। একটু পরে দেখি আমার পাশে বসা এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা রুমালে চোখ মুছছেন। আশেপাশে তাকিয়ে দেখি প্রায় সবারই চোখে পানি। গানটি এর পরে অনেকের গলায় শুনেছি - ওরকম করে আর কেউ গানটি গাইতে পারেন নি বলে মনে হয়। আসলে বয়সের সাথে সাথে, অভিজ্ঞতার সাথে সাথে কিছু কিছু জিনিস পূর্ণতা পায় - এ গানটিও ছিল তেমনি এক পরিবেশনা।

আর একটি ঘটনার কথা বলছি। আমার বাবা মারা গেছেন সদ্য। খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি দেশে গেলাম, তবে বাবার সাথে আর কথা বলা হোলো না - তিনি তখন পরলোকে গমন করেছেন। কিছুদিন থেকে আবার ফিরে এলাম সিডনী,। অফিসে শুরু করলাম। কিন্তু সারাক্ষন ঘুরেফিরে শুধু বাবার কথাই মনে হোতো। বাবার সাথে মানুষের কত না স্মৃতি থাকে। বাবার সাথে একসাথে গান করেছি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাবার বক্তৃতা শুনেছি, বাবার কারণে অনেক গুনী লোকের সাহচর্য পেয়েছি, এমনি নানা স্মৃতি বারবার ভেসে উঠতো, ভেতরে ভেতরে একরকম কান্না চলছিল সারাক্ষন। তখন কবিগুরুর একটা গানের কথা খুব মনে হোতো - 'আমার লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রুনীরে - অশ্রুত বাঁশী হৃদয় গহনে বাজে। আমার না বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে- তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে।' অঝরা অশ্রুনীরে যে কাঁদা যায় - সেই প্রথম অনুভব করলাম। বাবার ভাবনা এখনো আমার জীবনে তারার মতন রাজে।

প্রতীতির বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে - আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও - গানটি যখন আমরা গাই - তখন সবাই গানটির অর্থ মনের ভেতরে ধারন করেই গাই। তখন মনে হয় যেন অরুণ আলোর সোনার কাঠি ছুয়ে যায় সব শ্রোতার অন্তরে। মনে হয় অপূর্ব এক স্নিগ্ধতায় ভরে গেল সকালটা। মনটা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, কি যেন এক আবেশে হৃদয় ভরে যায়। সেই ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় হৃদয় আপনাআপনিই নুইয়ে আসে।

কবিগুরুর রচনার কৃতিত্ব এখানেই। তাঁর লেখায় যে দর্শন, নন্দনতত্ব, প্রকৃতির নান রুপের-নানা বর্ণের যে পরিচয়, ইশ্বরের আরাধনা, স্বদেশপ্রেম, মানবপ্রেম, সবকিছু এত ব্যাপকতার সাথে উদ্ভাসিত হয়েছে যে একে প্রাণের গভীরে আশ্রয় না দিয়ে উপায় নেই। তাঁর লেখা বার বার পড়লে, এর অর্থ ভালো করে বুঝতে পারলে, তা এক বিশেষ অর্থ বহন করে বলে আমার মনে হয়। ক্রমে তা আমাদের বোঝার গভীরতা বাড়িয়ে দেয়, আমাদেরকে ঋদ্ধ করে তোলে, মানুষ করে তোলে।

কবিগুরুর লাস্ট-টেস্টামেন্ট বলা যায় তাঁর শেষ জন্মদিনে তাঁর অভিভাষণকে - যা পরে সভ্যতার সংকট নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর মতে সংস্কৃতি এক রকমের বুদ্ধিবাদ যা মনকে শিক্ষিত করে, সংস্কৃতির কাজ হচ্ছে বুদ্ধিদীপ্ত সংস্কৃতি নির্মান করা। এই প্রবাসে আমরা আমাদের সংস্কৃতি নির্মান করবো আমাদের মূল্যবোধ দিয়ে, এর ভাষাকে সম্মান করে তৈরী হবে আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তি। এই কাজটিই করে যেতে হবে আমাদের যারা নিজেদেরকে সংস্কৃতিবান বলে মনে করি। আমাদের সন্তানরা যেন রবীন্দ্রনাথকে জানে, তাঁর রচনা পড়ে নিজেদেরকে বাঙালি করে তোলে - এ কাজটিও কিন্তু আমাদেরই করতে হবে। তা না হলে এরা শুধু পাশ্চাত্য সংস্কৃতিটাই জানবে, কোনদিন জানতেও পারবেনা যে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি কতটা উচুমানের।

জীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ছিল এই যে, মানুষের জীবন আসলে একটি দ্বীপের মত - কিছুদিন এতে আলো এসে পড়ে, একসময় তা তলিয়ে যায়। যতদিন আমাদের জীবনে আলো থাকবে - আমরা যেন এ আলোয় নিজেদের উদ্ভাসিত করার প্রয়াসে ব্রতী হই, আলোয় আলোকময় করে তুলি আমাদের চারপাশকে। পৃথিবীর আর কোন কবির জন্ম ও মৃত্যুদিন এত ব্যাপকভাবে পালিত হয় বলে আমার জানা নেই। কবি-স্মরণ কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয় - প্রাণের টানেই আমরা কবিকে স্মরণ করি। প্রায় ৭০ বছর আগে বিদায় নিলেও রবির আলো আমাদের জীবনে এতটুকু কম আলো দেয়নি। আমরা এখনো বাস করে যাচ্ছি এ আলোর বলয়ে। এ আলো ছড়িয়ে পড়ুক সবখানে।